তাঁর হিমালয় যাত্রার প্রেক্ষাপটেই পিতার চিরিত্রধর্মকে বর্ণনা করেছেন সন্তানের একদিকে ছিল পূর্ণ সাধীনতা, ''অন্যদিকে সমস্ত আচরণ অলঙঘ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল,'' কোথাও কোনো বেনিয়মের ছিদ্র ছিল না।

যাত্রার পথে প্রথম থামার কথা বোলপুরে। এইখানে তাঁর ভাগিনেয় সত্যস্নাদের কথা বলছেন, যিনি সরল কবিকে প্রচুর ভয় দেখিয়েছিলেন রেলগাড়ী সম্বন্ধে। কিন্তু রোমাঞ্চকর কিছু না ঘটাতে রবীন্দ্রনাথ একটি বিমর্ষ হয়েছিলেন। সত্যপ্রসাদ তাঁর বালক স্বভাবের সুযোগ নিয়ে সম্ভব অসম্ভব নানা ঘটনা বলতেন, আর কিশোর কবি তার চাক্ষুশ প্রমাণ দেখতে চাইতেন। রেলগাড়ি যখন ছুটে চলেছে, তখন কবি মুগ্ধ হয়ে আস্বোদন করেছেননিসর্গের সৌন্দর্যকে। সকাল পেরিয়ে সন্ধ্যাবেলা বোলপুরে পৌঁছেলেন।

অভিজাত নাগরিক পরিবারের সন্তান রবীন্দ্রনাথ। তিনি কখন ধানক্ষেতে দেখেননিষ রুক্ষনায় দেখেছেন রাখালবালকের সঙ্গে একসঙ্গে ভাত খাচ্ছেন। কিন্তু কল্পনার রেশ মিলিয়ে যেতেই দেখলেন রুক্ষ মাটির বিশাল প্রান্ত্র, সেখানে তাঁর অবাধ বিচরণে কোনো নিষেধ ছিল না। 'খোয়াই' রবীন্দ্রনাথের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীবন্ধ ছিল। কাকে খোয়াই বলে তার বিবরণ তিনি দিচ্ছেন 'জীবনস্মৃতি'তে।'' বোলপুরের মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ষার জলধারায় বালিমাটি (য় করিয়া প্রান্তরতল হইতে নিম্নে লালকাকর ও নানাপ্রকার পাথরে খচিত ছোট ছেটো শৈলমালা গুহাগহ্বর নদী-উপনদী রচনা করিয়া, বাল্যবিলাদের দেশের ভুবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছে। এখানে এই ঢিবিওয়ালা খাদগুলিকে খোয়াই বলে। মহর্ষি, রবীন্দ্রনাথের পথের সামান্য সঞ্চয়ের আগ্রহকে উৎসাহিত করতেন। তিনি পুত্রের সর্বব্যাপী কৌতূহলের দরজাটি অবারিত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু শিশুর মনের আক্ষেপ যে এই পরম যত্নে সঞ্চিত পাথরগুলি তাঁকে ফেলে আসতে হয়েছিল। পরিণতবয়সের রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক উপলব্ধি তাঁকে নিস্পৃহ হবার শিক্ষা দেয়নি। তাই সঞ্চয় ও সম্বমন্ববোধের নিকটত্ব তাঁর অনুভূতিতে চিরদিনই জাগ্রত ছিল। বোলপুর বাসকালে তাঁর কোনো প্রার্থনাই দেবেন্দ্রনাথ অপূর্ণ রাখতেন না। পুত্রের অদম্য প্রকৃতিপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গে তাকে জাগতিক বাস্তববোধেও সচেতন করে তুলেছিলেন। তাই পয়সার হিসেব রাখতে দিলেন, দামি সোনার ঘড়িতে দম দিতে বললেন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, সম্ভবত পুত্রকে দায়িত্বশীল করার জন্য এই প্রচেষ্টা। কিন্তু স্মৃতির সরল রোমন্থনে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন— সেই বালকরি হিসাবও সঠিক হত না, তহবিল বেড়ে যেত, এবং অতিরিক্ত যত্নের অত্যাচারে ঘড়িটিও কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করল মেরামতের জন্য। বড় হয়ে জমিদারীর কাজ পরিচালনার দায়িত্বে থাকাকালীন হিসাবপত্রের ব্যাপারে কোনোদিন কোনো অসংগতি থাকলে দেবেন্দ্রনাথ তা সহজেই বুঝতে পারতেন। অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল দেবেন্দ্রনাথের। ভগবদ্গীতার তাঁর পছন্দের শ্লোকগুলি বাংলা-অনুবাদসহ রবীন্দ্রনাথকে লিখে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়ায় বালক কবি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছিলেন। বোলপুরে তাঁর সচেতন কাব্যচর্চার একটি রসাল বর্ণনা দিয়েছেন। বাগানে নারকেলগাছের তলায় পা ছড়িয়ে যা দেখছেন যা ভাবছেন তাই দিয়ে পাতার পাতার পাতা ভরে তলেছেন একটা কবিজনোচিত ভঙ্গাগতে। আজকের যুগে ভাবতে বিস্ময় লাগে যখন রবীন্দ্রনাথ সরল মন্তব্য করেন, ''শুধু কবিতা লেখা নহে, নিজের কল্পনার সম্মুখে নিজেকে কবি বলিয়া খাড়া করিবার একটা চেষ্টা জন্মিয়াছে। সেই বালক কবির সৃষ্টিপ্রচেষ্টা সার্থকতামন্ডিত হয়ে যে দুরন্ত গতি ঝরণার মত দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়বে, কে জানত সে কথা।

আরও অনেক কথা এই যাত্রাবিবরণে ছড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের বয়স নিয়ে টিকিট পরীক্ষকের 'সন্দেহের ক্ষুদ্রতা' তাঁর পিতাকে অত্যন্ত অপমানিত করেছিল। তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন কঠোরভাবে। আবার অমৃতসরে শিখ গুরুদরবারে গিয়ে ভজন গান শুনতেন, সেই গানে দেবেন্দ্রনাথও যোগ দিতেন। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথকে তিনি ডাকতেন ব্রহ্মসংগীত শোনানোর জন্য। জ্যোৎস্নার আলোছায়ার মধ্যে এক অপূর্ব মনোরম পরিবেশে বেহাগ রাগে তিনি গাইতেন—

'তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে
কে সহায় ভব অন্ধকারে।'

মুগ্ধ হয়ে দেবেন্দ্রনাথ শুনতেন। আবার রবীন্দ্রনাথ একটি সহাস্য পরিবেশ নিয়ে আসছেন স্মৃতির কথায়। আগের একটি অংশে উল্লেখ করেছিলাম শিশু রবীন্দ্রনাথের 'ভবযন্ত্রণা' বিষয়ক গান রচনায় দেবেন্দ্রনাথ হেসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "বড়ো বয়সে আরেকদিন আমি তাহার শোধ লইতে পারিয়াছিলাম"। ঘটনাটি এই—মাঘোৎসবে অনেকগুলি গান রচনার মধ্যে একটি গান ছিল—'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে'। দেবেন্দ্রনাথ তখন চুঁচুড়ায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথকে তিনি সব গানগুলিই গাইতে বলেছিলেন এবং গানের শেষে পাঁচশত টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। ইংরাজী, সংস্কৃত,বাংলা সব কিছু চর্চাই তাঁর পিতার সঙ্গে চলত। সরলপাঠ্য ইংরাজী জ্যোতিষগ্রন্থ থেকে মুখে যা বলতেন, রবীন্দ্রনাথ তা বাংলায় লিখতেন। অমৃতসরের পর ডালহৌসী পাহাড়ে যাত্রা, তখন চৈত্রমাস। পিতৃদেবের মতো হিমালয়ের আহ্বানে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তিনিও। পার্বত্য উপত্যকার নৈসর্গিক চিত্র তিনি দু'চোখ ভরে দেখতেন। চৈতালী ফসলের রঙের বাহার পথের বাঁকে নিবিড় ছায়ারচনাকারী বনস্পতি, পাথরের গা দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝরণার কলধ্বনি—চলার পথে এইসব দৃশ্য তাঁকে আবিষ্টকরে রাখত। ডাকবাংলায় বসে সন্ধ্যাকাশের নক্ষত্র দেখে পিতার সঙ্গে জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা হত। মনে হয় এই সূত্র থেকেই বিশ্বজগৎ ও বিশ্বসৃষ্টির বিপুল রহস্য সম্বন্ধে তাঁর চেতনার প্রথম জাগরণ। তাঁদের বাসা ছিল পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়া বক্রোটায়। বৈশাখ মাস হলেও প্রবল শীত এবং তুষার আচ্ছাদিত। পায়ের যে শিকল কাটেনি পেনেটির বাগানবাড়ীতে, এখানে ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র—গতিবিধির অবাধ স্বাধীনতা। এই সময়ে পাহাড়ের নানা জায়গায় তাঁর ভ্রমণের যে চিত্র সেখানেও প্রকৃতির শোভার সঙ্গে কবিমনের বহু বর্ণময় গাঢ় অনুভূতি ফুটিয়ে তুলেছেন স্মৃতির রেখায়। বনস্পতিতে তিনি দেখতেন "কত শত বৎসরের বিপুল প্রাণ"। এই বৃক্ষ তাঁর কাব্যরচনায় নানা উপলব্ধিতে প্রকাশ পেয়েছে; সূচনাপর্বটি এই হিমালয় যাত্রা। এই বনানীর মধ্যে একটি নিঃশঙ্ক হৃদয় ঘুরে ঘুরে শুনতে চায় সেই বনবাণীকে। বনের ছায়ায় তাঁর উপলব্ধির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধৃত করছি—"যেন সরীসৃপের গাত্রের মত একটি ঘন শীতলতা এবং বনতলের শুষ্ক পত্ররাশির উপরে ছায়া আলোকের পর্যায়ে যেন প্রকান্ড একটা আদিম সরীসৃপের গাত্রের বিচিত্র রেখাবলী"। এই গাঢ় শীতল অনুভূতি কবির মনের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিচিত্র উপলব্ধির সৃষ্টি করেছে তাঁর রচনায়—কোথাও নির্জনতা সৃষ্টিতে, কোথাও মনের একাকীত্বের অনুভূতিতে, আবার কোথাও তীব্র মানসিক সঙ্কটের সম্ভাবনায়।

রাত্রে পিতার উপাসনার দৃশ্য কবিকে অভিভূত করত। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ছন্দপতন, যখন সংস্কৃত শব্দরূপ মুখস্থ করার জন্য সেই শীতের ভোরে বিছানার উষ্ম সুখস্পর্শ থেকে বেরিয়ে আসতে হত। সূর্যোদয়কালে তিনিও পিতার সঙ্গে উপনিষদের মন্ত্রপাঠ করতেন। অসাধারণ নিয়মানুবর্তিতায় চলতে হত—প্রাতঃভ্রমণের পর ইংরাজী পড়া, তারপর বরফগলা জলে স্নান। শিশুকাল থেকেই বরাদ্দ দুধ না পাওয়ার অভ্যাসে এখানে অভাব না থাকলেও তাঁর রুচি ছিল না। মধ্যাহ্নভোজনের পর আবার পড়া, কিন্তু ভোরের ঘুম যথেষ্ট না হওয়ায়, তাঁকে নিদ্রাদেবী আশ্রয় করতেন এবং ছুটি মঞ্জুর হত। ততক্ষণাৎ নিদ্রা অন্তর্ধান করত। তিনি বিনা বাধায় পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার হৃদয়ধর্মকে এই ভ্রমনকাল থেকেই একান্তভাবে উপলব্ধি করেছেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছেন যে চরিত্রগঠনে তাঁর কত সতর্ক এবং সজাগ দৃষ্টি ছিল। মানুষের প্রত্যেকটি কাজের সঙ্গে তার অন্তর সম্বন্ধযুক্ত হবে, মনের গভীর থেকে যে সত্যবোধ জেগে উঠবে, তা হবে চিরস্থায়ী, সেইখানেই সত্যের কাছে মাথানত হবে। "তিনি ইহাও জানিতেন যে, সত্য হইতে দূরে গেলেও একদিন সত্যে ফেরা যায়, কিন্তু কৃত্রিম শাসনে সত্যকে অগত্যা অথবা অন্ধভাবে মানিয়া লইলে সত্যের মধ্যে ফিরিবার পথ রুদ্ধ করা হয়।" মনোবল এবং সাহসিকতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা তিনি সমর্থন করেছেন, পুত্রের মানসিক বিকাশে সাহায্য করেছেন। নানা অসম্পূর্ণতা মাঝে মাঝেই রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করেছে তাঁর জীবনের বহু পদক্ষেপে। কিন্তু প্রতিকারের পূর্ণ ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ভাঙা সমীচীন নয়—এইটাই ছিল দেবেন্দ্রনাথের দূরদর্শিতা কিন্তু নিজের মতকে প্রাধান্য না দিয়ে

সন্তানকে ভুলভ্রান্তি অসাবধানতার মধ্য দিয়ে তাঁর গম্যস্থানকে চিনে নিতে সাহায্য করেছিলেন। এ তো হল জীবনের আদর্শ তৈরী করার মহান ব্রত। কিন্তু প্রাত্যাহিক কর্মজীবনটিও তিনি লক্ষ্য রেখেছিলেন। পাহাড়ে থাকাকালে অচেনা পিতা রবীন্দ্রনাথের কাছে একান্ত অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে উঠেছিলেন, যেখানে বাড়ীর অন্য সকলের সঙ্গে তাঁর একটা অভেদ্য দূরত্ব ছিল। বালকপুত্রের মুখে তিনি তাঁর বাড়ীর গল্প শুনতেন। আবার দাদাদের কাছ থেকে চিঠি এলে তিনি রবীন্দ্রনাথকে পড়তে দিতেন চিঠি লেখার পদ্ধতি শেখার জন্য। কোনো বিষয়ে তর্ক উঠলে বিপুল ধৈর্য নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করতেন।

পিতাপুত্রের মধ্যে যে ক্রমশঃই একটি সস্নেহ প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠছিল, পুত্রের সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন কৌতুকের গল্প তাঁর প্রমাণ। তারপর এসেছে প্রত্যাবর্তনের পালা। কয়েকমাস থাকার পর কিশোরী চাটুজ্যের সঙ্গে তিনি ফিরে এলেন।

'জীবনস্মৃতি'তে বর্ণিত পিতার সঙ্গে পুত্রের এই সংযোগ রবীন্দ্রজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশী একটি রচনায় রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে দেবেন্দ্রনাথকে দেখার এক মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করেছেন। "শৈশবে, বাল্যকালে ও যৌবনে যখন মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি ধীরে ধীরে গঠিত হয়ে উঠে নির্দিষ্ট আকার লাভ করে এবং তাকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে থাকে তখন দেবেন্দ্রনাথের চেয়ে মহত্তর মানুষ দেখবার সুযোগ রবীন্দ্রনাথের হয়নি; এই মহাপুরুষের নিত্যসান্নিধ্য অগোচরে ও সগোচরে তাঁর মন ও মতামত গঠিত করে তুলেছে; পিতা ও পুত্র ভিন্ন পথের পথিক হলেও পুত্রকে এমন পাথেয় দিয়েছে, যে পুঁজি কখনও নিঃশেষ হয়নি বরঞ্চ পুত্রের প্রতিভার সংযোগে ঐশ্বর্যে পরিণত হয়েছে।"[১]

দেবেন্দ্রনাথ কি এমন বিশেষত্ব দেখেছিলেন তাঁর এই সন্তানটির মধ্যে সেটিও এখানে ভাবা প্রাসঙ্গিক। স্কুলে যাওয়ার ভীতি থেকে রক্ষা পেলেন রবীন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণের আহ্বানে। জোড়াসাঁকোর বৃহৎ পরিবারে অনেক শিশুর মধ্য থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে আনলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া খুব স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনের গভীরে একটি নিঃসঙ্গ সত্তা রয়েছে, যে বহুজনের মধ্যে থেকেও একাকীত্ব রক্ষা করে, এটি মহর্ষি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন। হিমালয়ের নির্জনতা ছিল তাঁর সাধনার ক্ষেত্র; তাঁর নিভৃতচারী এই পুত্রের মননবিকাশের প্রশস্ত স্থান হিসাবেও তিনি পার্বত্য বনভূমির নির্জনতাই উপযুক্ত মনে করেছিলেন। তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ হিমালয় ভ্রমণ ঘটনাটি নানা সরস মন্তব্যের মধ্য দিয়ে 'জীবনস্মৃতি'তে লিখলেও, তিনি নিজেও জানতেন কয়েকটি মাস পিতার এই সান্নিধ্য থেকেই তাঁর অন্তরমুখী কবিসত্তা সারাজীবনের পাথেয় সঞ্চয় করেছে।

প্রত্যাবর্তন

হিমালয় ভ্রমণ থেকে রবীন্দ্রনাথ দেহে মনে এক স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে ফিরলেন—'প্রত্যাবর্তন' অংশে তারই পরিচয় পাই। শিশুকালে তিনি ছিলেন ভৃত্যমহলে নির্বাসিতের দলে। সে গন্ডী তিনি ভাঙলেন, অন্তঃপুরে যাওয়া আসার অবাধ অধিকার পেলেন। সব থেকে বড় লাভ, মায়ের ঘরের আসরেও তাঁর প্রবেশ ঘটল, বাড়ীর তখনকার কনিষ্ঠ বধূটি তাঁর স্নেহ উজাড় করে দিলেন। এখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বস্মৃতির একটি ছবি তুলে ধরেছেন। ভৃত্যদের অভিভাবকত্বে মানুষ শিশু রবির কাছে অন্তঃপুর ছিল এক কল্পনার রাজ্য। মেয়েদের অযাচিত আদর ভালবাসা পাওয়ার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। মনে হত সব স্বাধীনতা রয়েছে অন্তঃপুরের অন্তরালে। মেয়েদের নিয়মবিধির সঙ্গে তাঁদের ছিল দুস্তর ব্যবধান। মন আরও বিকল হয়ে যেত যখন সুসজ্জিতা নববধূটি বাইরের পরিবার থেকে তাঁদের অন্তঃপুরে স্থান নিত, কিন্তু তার সঙ্গে শিশুর হৃদয়বিনিময়ের কোনো যোগ থাকত না, তার সঙ্গে আবার আলমারীতে কত রঙীণ

---

১. প্রমথনাথ বিশী-রবীন্দ্র কাব্য প্রকৃতি ও জীবনসাধনার উপরে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব। দ্রঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা—বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৪ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৫

উজ্জ্বল দ্রব্যের সম্ভার। সবই ছিল অধিকারের বাইরে, দূরের ছবি। ''বাহিরের প্রকৃতি যেমন আমার কাছ হইতে দূরে ছিল, ঘরের অন্তঃপুরও ঠিক তেমনি।' ' সেই অর্ধপরিচিত কল্পলোকবাসী অন্তঃপুরিকাদের আকস্মিক ভালবাসার আতিশয্য স্বল্পসময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অস্বস্তি দূর করতে পারেনি, এ খবর তিনি নিজেই বলেছেন। কল্পনার বিরাট জাল বুনে তাঁর ভ্রমণকাহিনী ঘরে ঘরে তিনি বলতেন এবং বারংবার বলা পুরানো গল্পের আকর্ষণ বাড়ানো হত আরও রঙে বৈচিত্র্যে দিয়ে। মায়ের ''বায়ুসেবনসভায়'' প্রধান বক্তার পদ পেয়ে তিনি খুবই গৌরবান্বিত হয়েছিলেন। নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার, অলংকারসমৃদ্ধ কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতির দ্বারা তিনি দেখাতে চাইলেন, ''যাহাকে দেখিতে ছোটো সেও হয়তো নিতান্ত কম বড় নয়।'' কিন্তু আসর বেশি জমে উঠল পাঁচালি গায়ক কিশোরী চাটুজ্জের নানা রঙ নানা ভাবের গানে। বালক রবীন্দরনাথ অতি উচ্ছাসিতভাবে সলের মধ্যে নিজে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কৃত্তিবাস বাদ দিয়ে বাল্মীকির রামায়ণ শোনাতে চাইতেন মাকে। মা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, কিন্তু ঋজ্জপাঠের সামান্য বিদ্যা দিয়ে আসল ও তার স্বরচিত ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য হলো না। তবুও মাতা পুলকিত হয়ে জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথকে শোনাতে চাইলে, তিনি সহজেই তাঁর বালকভ্রাতার অসম্পূর্ণতা বুঝতে পারলেন।

আবার এল স্কুলে যাবার পাল, প্রথমে 'বেঙ্গল একাডেমি', সেখানে থেকে পালানোর পর 'সেন্টজেবিয়ার্স স্কুলে'। বিদ্যালয়ে মনের বিরুদ্ধ পরিবেশের ধাক্কা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অসহনীয় ছিল নিঃসন্দেহে। 'জীবনস্মৃতি'র অনেকটাই জুড়ে আছে সেই ক্ষোভের চিত্র। শিক্ষাপদ্ধতির পীড়ন শিশুমনকে পিষ্ট করে দেয়(রবীন্দ্রনাথের সেই আংশকা আজকের নুতন শতাব্দীতে কি বিভীষিকা হয়ে উঠেছে, সে কাহিনী কারুরই অজানা নয়। কিন্তু এই স্কুলে কোনো কোনো শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশেষ সম্মাননত ছিলেন। একজন্য প্রধান অধ্যাপক, ফাদার হেনরি, আরেকজন স্পেনীয় শিক্ষক ফাদার ডি পেনেরাডা, এক গভীর মমত্ববোধ নিয়ে তাঁর কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মুখশ্রী সুন্দর নয়, ইংরাজী উচ্চারণ সঠিক নয়, তবুও তার সহৃদয়তায় রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তার মনে হয়েছিল এক নিবিড় স্তব্ধতায় তিনি নিজেকে আবৃত রেখেছেন। অল্প কয়েকটি শব্দে তাঁর স্নেহের যে স্বাদ তিনি পেয়েছিলেন, তার থেকেই সেই হৃদয়টি বিশ্বকবির মনে দেবমন্দিরের স্থান নিয়েছিল।

ঘরের পড়া

বিদ্যালয়ের গন্ডীতে যখন রবীন্দ্রনাথকে বাঁধা গেল না, তখন তার শিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য কুমারসম্ভব, ম্যাকবেথ প্রভৃতি বাংলায় বোঝাতে লাগলেন এবং সেইসঙ্গে ম্যাকবেথকে বাংলা ছন্দে তর্জমা করতে বাধ্য করলেন। সংস্কৃত শিক্ষক রামসর্বস্ব পন্ডিত শকুন্তলা পড়াতেন. এই সময়ে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটল। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ম্যাকবেথের তর্জমা শোনানোর জন্য তাকে নিয়ে গেলেন পন্ডিতমশাই, সেখানে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। উভয়ের কাছেই তিনি উৎসাহ ও উপদেশ পেয়েছিলেন। রাজকৃষ্ণ বসু বলেছিলেন— ''.....ডাকিনীর উক্তিগুলির ভাষা ও ছন্দের কিছু অদ্ভূত বিশেষত্ব থাকা উচিত।''

রবীন্দ্রনাথ বারবারই ফিরে এসেছেন শিশুমনের প্রসঙ্গে। তাঁর যুগে আজকের মত বাংলাসাহিত্যের অপরিমিত ভাণ্ডার ছিল না, তাঁরা পাঠ্য অপাঠ্য সব বই-ই পড়েছেন, ক্ষতি হয়নি কিছু। তিনি ছেলেভুলানো শিশুসাহিত্যকে সমর্থন করেননি, সেগুলি মনের বিকাশে সাহায্য করে না। তাঁর মতে ছেলেদের বই পড়ার মধ্যে কিছু বোঝা কিছু না বোঝা অংশ থাকে, তার মধ্য দিয়েই মন নিজেকে তৈরী করে নেয়। দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাইবারিক' রজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' কৃষ্ণকুমারী' উপন্যাস প্রভৃতির কোনোটিই তাঁর বয়সে পড়ার উপযুক্ত(না হলেও তিনি একটি মন্তব্য করছেন, যা বোধকরি আজকের যুগে খুবই প্রাসঙ্গিক। বলছেন, 'সর্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাইনা।''

এবার তিনি এমন একটি পত্রিকার কথা বলছেন; যার জ্ঞানবৃদ্ধির থেকেও মনের চাহিদা মেটাবার দিকেই প্রবণতা। পত্রিকাটির নাম 'অবোধবন্ধু'। এখানেই তিনি মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা—"তাঁহার সেই সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত।" বিলাতী পৌলবর্জিনী গল্পের বাংলা অনুবাদও তাকে খুব বেশি আকৃষ্ঠ ও প্রভাবিত করেছিল। সারাজীবন এই গল্পরসের আস্বাদনে অভিভূত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

তারপর এল বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় অতি জনপ্রিয় পত্রিকা 'বঙ্গদর্শন'। প্রতিটি উপন্যাস এক একটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত। ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করতেন পরেরটির জন্য। "—তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেকদিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি।" এই পড়ার অনুভূতি এক অনাস্বাদিত রসভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছিল তাঁর মনে।

সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকারের প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছিল তাঁকে। নির্দ্বিধায় এবং নির্বিচারে বইপড়া যে মনের ক্রমবিকাশে সাহায্য করে 'ঘরের পড়া' অংশে রবীন্দ্রনাথের সেই অভিমতটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

বাড়ীর আবহাওয়া

উনিশ শতকের নবজাগরণের ঢেউকে স্পর্শ করেও রবীন্দ্রনাথের পিতৃপরিবার একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে অবস্থান করত। সমগ্র পরিবারটিতে শিল্পসাহিত্যসংস্কৃতি চর্চার এক বিপুল আয়োজন ছিল। শিশু রবীন্দ্রনাথের প্রবেশের অধিকার ছিল না সেই জগতে। তবুও তিনি তার সন্ধান দিয়েছেন 'জীবনস্মৃতি'তে। তাঁর পরিবারের অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ কিছু মানুষের কথা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই বলেছেন তাঁর খুড়তুতো ভাই গণেন্দ্রনাথের কথা। তিনি দীর্ঘায়ু হননি, কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যেই অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন সামাজিক সম্পর্কগুলিকে বেঁধে রাখার। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"সাহিত্য এবং ললিতকলায় তাঁহাদের উৎসাহের সীমা ছিল না। বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্‌বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশে-ভূষায় কাব্যে গানে চিত্র-নাট্যে ধর্মে-স্বাদেশিকতায়, সকল বিষয়েই তাঁহাদের মনে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল। পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাস চর্চায় গধদাদার অসাধারণ অনুরাগ ছিল।"

এরপর বলছেন গণেন্দ্রনাথের ছোটভাই গুণদাদার কথা। তিনি আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে সকলকেই গভীর মমতা দিয়ে নিজের প্রশস্ত হৃদয়ে আপন মনে করে স্থান দিতেন। "আমোদ উৎসবের নানা সঙ্কল্প তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া নব নব বিকাশলাভের চেষ্টা করিত।" এই গুণদাদার স্নেহসরস হৃদয়টি রবীন্দ্রনাথ চিরদিন স্মরণে রেখেছেন। গুণদাদার কোলের কাছে বসে তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস শুনতেন, এমন কি শিশুকবির কবিতারও রসগ্রহণে তিনি বিমুখ ছিলেন না।

তারপরে বলেছেন তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের কথা। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের স্রষ্টা এই মানুষটির প্রাণখোলা উচ্ছ্বাস তাঁকে নানাবিধ রচনায় অনুপ্রাণিত করত। কিন্তু লেখাগুলি তাঁরই অনাদরে হারিয়ে গেছে, থাকলে বাংলাসাহিত্যের সম্পদ আরও বৃদ্ধি পেত। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, তাঁর বিপুল আবেগ নিয়ে লেখা 'স্বপ্নপ্রয়াণ' শিশুমন অনেকটাই বুঝত না, "কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম, তাহারই আনন্দ-আঘাতে শিরা-উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত।"

পরিবারের দু' একজনের কথা বলে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন এক বিরাট উপলব্ধির জগৎকে, যা ছিল এক গভীর আত্মিক অনুভূতির সমন্বয়ে উজ্জ্বল। জীবনস্মৃতি যখন লিখছেন, তখনই সে সম্পর্ক অস্ত গেছে। কালের ব্যবধানে মানবমনের পরস্পরের সম্পর্কে দূরত্ব এসে গেছে। মানুষ একত্রিত হয় প্রয়োজনে। "মজলিশে" বসে অপ্রয়োজনের আনন্দে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ার সেই দিনটি হারিয়ে গেছে। একান্নবর্তী পরিবারে সব আয়োজন ছিল সকলের জন্যে।

আত্মকেন্দ্রিকতায়র মোহ তখনও গ্রাস করেনি মানুষকে। কিন্তু পরিবর্তনের ঢেউ বিপর্যস্ত করেছে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে, সাদাসিধে পোষাকে বিনা আহবানে আর ঘরে ঢুকে আসর জমানের অধিকার নেই। এখানে রবীন্দ্রনাথ সমাজের যে ভাঙনের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করছেন, সেই ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা তাঁর যুগের থেকেও বোধকরি আজকের যুগে বেশি। ইংরেজদের নিজেদের প্রণালীমত সমাজ ও 'বহুব্যাপ্ত' সামাজিকতা রয়েছে। আমাদেরও আছে। কিন্তু সাহেবি রীতিতে আত্মসমর্পণ করে আমার ঘরকে হারিয়েছি আর পরও আমাদের গ্রহণ করেনি। হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ, আদানপ্রদান বন্ধ হয়েছে আর নিজেকে আবদ্ধ রেখেছে নিঃশ্ছিদ্র দূর্গে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, এটি একটি কুশ্রী সামাজিক কৃপণতা।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

জোতিরিন্দ্র ঠাকুরের বন্ধু অ(য়চন্দ্র চৌধুরী একজন্য সাহিত্যনুরাগী মানুষ ছিলেন। তিনি ইংরাজীতে স্নাতকোত্তর করলেও মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিওয়ালা পর্যন্ত তাঁর আগ্রহের সীমা ছিল না। বঙ্গদর্শনে তাঁর 'উদাসিনী' কাব্য প্রশংসা অর্জন করেছিল। নিজে অজস্র লিখে থাকলেও সেগুলি রক্ষা করার বিষয়ে যত্নবান ছিলেন না। অত্যন্ত প্রাণবন্ত মানুষ ছিলেন। যেখানে থাকতেন, সেখানেই আসর জমাতেন। মানুষের গুণটিই দেখতেন, সদানন্দ মানুষটির সাহিত্যরস আস্বাদনের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, সেইসঙ্গে ছিল সাহিত্যস্রষ্টাকে তা সে যে বয়সেই হোক, প্রবলভাবে উৎসাহিত করা। অনেকে না জেনেই তাঁর লেখা গান গাইতেন।

তাঁর সাহিত্য উপভোগের ঔদার্যের সঙ্গে ছিল সকল বয়সের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা। অপরিচিতের সভায় হত তিনি খুব স্বচ্ছন্দবোধ করতেন না, কিন্তু নিজের চেনা মহলে তিনি সকল মানুষের কাছেই সমাদৃত ছিলেন। বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দাদাদের সভা থেকে অনেকসময়েই গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসতেন তাঁর এলাকায় সেখানে তখনও শুনতেন ইংরাজী কাব্যের উচ্ছসিত ব্যাখ্যা, কখনও আবার বালক কবির রচনাকেও অপর্যাপ্ত প্রশংসায় ভরিয়ে তুলেছেন।

গীতচর্চা

রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই তাঁর শিশুকালের দাসত্বের বন্ধনকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মতে চিত্তের অবাধ স্বাধীনতার যদি অপব্যবহারও হয় তার থেকেই সদ্ব্যবহারের শিক্ষাও লাভ করা যায়। এই প্রসঙ্গটি তিনি এনেছেন 'গীতচর্চা' প্রসঙ্গে। এখানে তাঁর অনুপ্রেরণার মূল উৎস ছিলেন তার অগ্রজদের অন্যতম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ''জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে সমস্ত ভালমন্দর মধ্য দিয়ে আমাকে আপনার অন্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে।'' রবীন্দ্রনাথের শতসহস্র গান রচনা করার প্রথম প্রেরণা এসেছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহে। তিনি পিয়ানোয় যে বিভিন্ন ধরনের সুরসৃষ্টি কতেন, সেই সুরগুলিকে কথায় বেঁধে রাখার অনেকটা দায়িত্বই রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গীতের পরিমণ্ডলে মানুষ রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করে বলেছেন, সঙ্গীতশিক্ষার ক্ষেত্রে গতানুগতিক পথে তিনি এগোননি। সহজাত ভাবেই গানে তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল।

সাহিত্যের সঙ্গী

রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনার সহমর্মী হয়েছেন, এমন অনেক মানুষের কথা রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন তাঁর জীবনস্মৃতিকে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম বিহারীলাল চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রীতির অনত্যম সঙ্গী ছিলেন তার বউঠাকুরানীও। সাহিত্যচর্চায় নিমগ্ন হওয়ার আগের চিত্রটি রসিক রবীন্দ্রনাথকে চেনায়। তিনি বলছেন হিমালয় তাকে মুক্তি(র স্বাদ দিয়েছিল, তিনি ভৃত্যশাসন এবং বিদ্যানিকেতেনর বন্ধ পরিবেশ থেকে মুক্ত হলেন। তাঁর গৃহশিক্ষকরাও নিয়মচালিত শি(ায় তাকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যর্থ হলেন। ফলে তিনি যে জীবনে কিছু করতে পারবেন না এ সম্বন্ধে বাড়ির লোকের

সঙ্গে তাঁর নিজেরও সন্দেহ ছিল না। তাঁর একটিমাত্র কাজ ছিল, কবিতার খাতার পাতা ভরানো। বলছেন, অনেক কথা যেন তপ্ত বাষ্পের মত ফেনিয়ে ওঠে, আবেগের দুর্দমনীয় গতি নিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। সেই যুগের কবিতার ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে আসবে প্রবল চেষ্টা ছিল। কিন্তু সার্থকতা না আসায় দুরন্ত আ(েপ। যখন সক্তির পরিণতি হয় নাই অথচ যেন জন্মিয়াছে তখন সে একাট ভারি অন্ধ আন্দোলনের অবস্থা।

এই সময়েই বৌঠাকুরানীর সাহিত্যবোধ ও চর্চার তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁরা দুজনে দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য পরম শ্রদ্ধায় পড়তেন। এই কাব্যের কল্পজগৎ রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবেই প্রলুব্ধ করত। তার ভাব, তার রূপ, তার বিন্যাসপদ্ধতি— সর্বত্রই এক নিপুণ শিল্পীর কৃতিত্বের ছবি। এর সমতুল্য লেখার আশা রবীন্দ্রনাথ তখন ভাবতেই পারতেন না।

তাঁর বউঠাকুরানীর অরেকজন কবির বিশেষ রসগ্রাহী ছিলেন। তিনি 'সারদামঙ্গল' কাব্যের কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। বালক রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর গভীর স্নেহ ছিল। জীবনস্মৃতি লিখবার কালে রবীদ্রনাত এই রোমান্টিক ভাবঐ(র্যর কাব্য ও তার স্রষ্টা সম্বন্ধে বলেচিলেন, ''তাঁহার মধ্যে একটি পরিপূর্ণ কবির আনন্দ ছিল'', যাকে আত্মস্থ করার জন্য ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অপে(া করতেন বালক কবি।

'সাহিত্যের সঙ্গী'র প্রেক্ষাপটেই রবীন্দ্রনাথ 'স্বপ্নপুরাণ ' কাব্য ও বিহারীলাল চক্রবর্তী র প্রসঙ্গে এনেছেন। বউঠাকুরনী ও রবীন্দ্রনাথে মনে সাহিত্যপ্রীতি এক সুরে বাঁধা ছিল। এই মধুর সম্পর্কে মাঝে মাঝে এক কোমল অভিমান ঘিরে ধরত রবীন্দ্রনাথকে। কারণ বিহারীলালের ভক্ত পাঠিকাটি কোনোমতেই তাঁর দেবরের কবিত্বশক্তিকে গান নিয়েও তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই উচ্ছ্বাসিত হতেন না। তবুও কবি নিরাশ হননি, কবিতা রচনার বিপুল উন্মাদনাকে রোধ করা তাঁর অসাধ্য ছিল।

রচনাপ্রকাশ

রবীন্দ্রনাথের কবিতার বাইরের জগতে প্রকাশের ইতিহাস এই অংশে। তিনি পরিহাস করে বলছেন, জ্ঞানাঙ্কুর নামে একটি নতুন পত্রিকা— 'কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদগত কবির কাগজের কর্তপক্ষরা সংগ্রহ করলেন''। কালের বিচারে এই 'পদ্যপ্রলাপগুলি অপাংক্তে(য় বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। একটি স্মরণীয় ঘটনা সেই প্রসঙ্গে এসেছে। সেটি 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' কাব্য, মনে করা হত এটি কোনো মহিলা কবির লেখা। রবীন্দ্রনাথ অনেক বিদগ্ধ সাহিত্যসবোদ্ধার প্রশংসাকে খন্ডন করে জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় একটি গদ্যপ্রবন্ধ লিখলেন, তাতে বললেন এখানে ভাব ও ভাষার যে অসংযম, তাতে স্ত্রীলোকের লেখা বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। বেশ আড়ম্বর করেই তিনি খন্ডকবিতা, গীতিকবিতা ইত্যাদি বিভিন্ন ধারার লক্ষণ কি প্রভৃতি আলোচনা করেছিলেন। প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে তিনি তার মানসিক বিপর্যয়ের কথা খুব রসিকতা করে এখানে বর্ণনা করেছেন— 'কুক্ষণে জনম তোর, রে সমালোচনা'।

ভানুসিংহের কবিতা

'জীবনস্মতি'তে বিভিন্ন স্মৃতিকথার প্রেষাপটে ভানুসিংহ ও রবীন্দ্রনাথের অভিন্নতা তাঁর কাব্যজীবনে একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে। মধ্যযুগের কবি বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ভাষা কীভাবে তাঁর অধিগত হয়েছিল, সেই বিবরণ রয়েছে এই অংশে। 'ঘরের পড়া'তে রয়েছে যে প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করত, কিন্তু মৈথিলীমিশ্রিত ভাষা তাঁর আয়ত্তগম্য না হওয়ায় তিনি আরও তৎপরতার সঙ্গে প্রবেশপথটি খুঁজেছেন। প্রাচীন কাব্যগুলি বহুল প্রচলিত না হওয়ায় অনুসন্ধান তিনি আরও তৎপরতার সঙ্গে প্রবেশপথটি খুঁজেছেন। প্রাচীন কাব্যগুলি বহুল প্রচলিত না হওয়ায় অনুসন্ধান করে 'কাব্যরত্ন' খুঁজে বের করতে তৎপর হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এর আগে তিনি শুনেছিলেন বালক কবি চ্যাটারটন প্রাচীন কবিদের হুবহু নকল করতেন। রবীন্দ্রনাথও সেই চেষ্টাই

করলেন। "মেঘলাদিনে ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে' লিখলেন "গহনকুসুম কুঞ্জমাঝে"। তাঁর লেখা হিসাবে স্বীকৃতি না পাওয়ায় ছলনার আশ্রয় নিয়ে বললেন যে ভানুসিংহ নামে এক প্রাচীন কবির পদ তিনি সংগ্রহ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গেই কবিতাটি উচ্চমানের মর্যাদা পেল এবং এগুলি ছাপার দরকার এমন উৎসাহও তিনি পেলেন। এইবার রবীন্দ্রনাথ সত্য কথাটি জানালেন। আরেকটি ঘটনাও সরসভাবে বর্ণনা করেছেন। 'ভানুসিংহ', 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল। সেইসময়ে জার্মানী প্রবাসী ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করে বাংলা গীতিকাব্য সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং প্রাচীন পদকর্তা হিসাবে ভানুসিংহ যে মর্যাদা পেয়েছিলেন "কোনো আধুনিক কবির ভাগ্যে তাহা সহজে জোটে না। এই গ্রন্থখানি লিখিয়া তিনি ডাক্তার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথ নিজেই ভানুসিংহের কবিতার সমালোচনা করেছেন। ভানুসিংহ এবং প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্তার অনেকেই একই ভাষায় লিখেছেন, কিছু পার্থক্য ছিল নিঃসন্দেহে। এই ভাষা কৃত্রিম, মাতৃভাষা নয়। কিন্তু ভাবের দিক থেকে এক অনাবিল অবয়ব ফুটে উঠেছিল। ভাষার অনুকরণ থাকলেও ভানুসিংহের অন্তরধর্মের কৃত্রিমতা অস্বীকার করা যায় না। "তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজিকালকার সস্তা অর্গানের বিলাতী টুংটাং মাত্র"।

স্বাদেশিকতা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরম শ্রদ্ধা নিয়ে দেখিয়েছিলেন যে তাঁর চরিত্রে স্বদেশপ্রীতির এক দৃপ্ত ঔজ্বল্য ছিল, যা তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন নিজের পরিবারের মর্মমূলে। সেখানে জীবনাচরণে কিছু বিদেশীপ্রথা থাকলেও মহর্ষির স্থির হৃদয়ে স্বদেশভাবনা সদা দীপ্যমান ছিল। দেবেন্দ্রনাথের যুগ কিন্তু জাতীয়তাবোধ বিকাশের যুগ নয়। "তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন"। কিন্তু মহর্ষির পরিবারে মাতৃভাষা চর্চারই প্রাধান্য ছিল, এমনকি চিঠিপত্রের আদান প্রদানেও তিনি বাংলা ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। পরিবারের স্বাদেশিকিতার এক ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিণত ভাবনার বিশ্লেষণসহ।

হিন্দুমেলার আয়োজন হয়েছিল তাদের বাড়ীরই পৃষ্ঠপোষকতায়। "ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়।" "মিলে সবে ভারতসন্তান" গানটি এই উপলক্ষেই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেছিলেন। দেশানুরাগের বিভিন্ন দিক এখানে তুলে ধরা হয়েছিল। বালক রবীন্দ্রনাথও মহা উৎসাহে লর্ড কার্জনের সময়ে দিল্লীদরবার নিয়ে গদ্যপ্রবন্ধ এবং লর্ড লিটনের সময় কবিতা লিখেছিলেন দেশপ্রীতি আশ্রয় করে, কিন্তু ইংরাজসরকার বিচলিত হননি, পরম কৌতুকে সে কথা রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন।

আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের যে দীর্ঘ আন্দোলন, প্রথম অঙ্কুরটি কোথায় আত্মপ্রকাশ করেছিল তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 'স্বাদেশিকতা' পর্বের বিভিন্ন অংশে। 'স্বাদেশিক' সভার উল্লেখ করেছেন—প্রধান উদ্যোগী ও সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু। গলির মধ্যে পোড়ো বাড়ীর সেই রহস্যময় সভার প্রধান লক্ষ্যই ছিল গোপনীয়তা, যে উদ্দেশ্য বালক রবীন্দ্রনাথের বোধগম্য ছিল না। তিনিও একজন সভ্য ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মনের গঠনে কীভাবে দেশাত্মবোধের স্বদেশচেতনার ভিতটির পত্তন হয়েছিল, অতীতের সেই কাহিনী এই অংশে স্থান নিয়েছে। ইংরাজশাসনের ফলস্বরূপ যে একটা বিরাট সাংস্কৃতিক রূপান্তরের সম্ভাবনা ক্রমপ্রসারিত হয়ে উঠছিল, তাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বিষম বিকার'। 'জীবনস্মৃতি' রচনাকালে, তাঁদের শিশুকালের সুপ্ত বীরত্বের উদ্‌গীরণ, "উত্তেজনার আগুন"কে শ্রদ্ধার আবরণে সংহত করাকে তাঁর পরিণত চিন্তা দিয়ে বিশ্লেষণ করেছিলেন, কারণ পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত মর্মান্তিক সত্যটিকে ধরতে পেরেছিলেন। "একটা বৃহৎ রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে কেবল কেরাণীগিরির রাস্তা খোলা থাকিলে মানবচরিত্রের বিচিত্র শক্তিকে তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর চালনার ক্ষেত্র দেওয়া হয় না। রাজ্যের মধ্যে বীরধর্মেরও পথ রাখা চাই, নইলে মানবধর্মকে পীড়া দেওয়া

হয়। তাহার অভাবে কেবলই গুপ্ত উত্তেজনা অন্তঃশীলা হইয়া বাইতে থাকে— সেখানে তাহার গতি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং পরিণাম অভাবনীয়।'' রবীন্দ্রনাথের এই পূর্বকথা স্মরণ ও বিশ্লেষণ সচেতন মনকে সজোরে ধাক্কা দেয় নিঃসন্দেহে।

তারপর আবার সহাস্য বর্ণনা— জ্যোতিদাদার পরিচ্ছেদ পরিকল্পনা। ধুতি ও পাজামার মাঝামাঝি একটি পোষাক পরে তিনি কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে অসীম বীরভাবে চলাফেরা করতেন। রবিবারে ছিল সদলবলে শিকারে যাওয়ার বিশেষ আয়োজন। সেখানে রক্তপাত ছিল না, বরং বৌঠাকুরানীর দৌলতে আহারের ব্যবস্থা ছিল প্রচুর। ডাব পেড়ে পানীয়ের ব্যবস্থাও হত। জাতি-ধর্ম নির্বিচারে যেমন আহার চলত, তেমনি অপরাহ্নের প্রচন্ড ঝড়ে সুরে অসুরে সমস্বরে গানেরও বিরাম ছিল না।

স্বদেশী দেশলাই তৈরীর গল্প বলেছেন। সেই অগ্নিশিখা তৈরী করার যেমন খচর, তেমনি সেগুলি ক্ষীণপ্রাণ। দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগের প্রখরতা স্বদেশী দেশলাইতে রক্ষা পেল না। দেশীয় কাপড়ের কল শুধুমাত্র 'গামছার টুকরা' বার করলি। ক্রমেই কিছু বাস্তববোধসম্পন্ন মানুষের সংস্পর্শে এসে দেশপ্রেমের মত আলোড়ন স্তিমিত হয়ে গেল।

তারপর এসেছে রাজনারায়ণ বসুর কথা। নানা বিপরীত উপাদানে গড়া ছিল রাজনারায়ণ বাবুর প্রকৃতি। অপরিসীম পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও মনটি ছিল শিশুর মত অনাবিল। তাঁর হাস্যমুখর স্বভাব বালকবৃদ্ধ সকলকেই সমানভাবে গ্রহণ করত। তিনি একদিকে ছিলেন ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদিত আরেকদিকে দেশের হিতসাধনের চিন্তায় সদাসচেতন। ইংরাজীর ছাত্র হয়েও বাংলাভাষাসাহিত্য উপভোগের দরজাটি খুলে নিয়েছিলেন। একদিকে শিশুসুলভ সারল্য, আবার প্রখর তেজস্বীও। রবীন্দ্রনাথ আজীবন শ্রদ্ধাবনত ছিলেন এই মানুষটির প্রতি।

ভারতী

আরম্ভ করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর তারুণ্যের অস্থিরতা দিয়ে। ঠাকুরবাড়ী থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'ভারতী' পত্রিকা। সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষোলো। প্রথমেই তিনি কঠোর সমালোচনা করলেন 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের কারণ ''নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায়।'' 'দাম্ভিক' সমালোচনা দিয়েই 'ভারতী'তে তাঁর লেখার সূচনা। 'ভারতী'র প্রথম বছরেই তাঁর 'কবিকাহিনী' প্রকাসিত হল। এই কাব্যটি সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে জগৎ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কবিই নিজেত আত্মচিতরকেই বড়ে করে দেখার চেষ্টা করেছে। নিজেকে কবি হিসেবে কি করে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেথা সরসভাবেই অনেক ক্ষেত্রেই পরিবেশিত হয়েছে 'জীবনস্মৃতি'তে। বাল্যরচনাগুলি সম্পর্কে চিরদিনই রবীন্দ্রনাথ অস্বস্তিবোধ করতেন। 'কবিকাহিনী' লেখার সময়ে আত্মজীবনের উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের কখনই ছিল না, কিন্তু প্রথম উদগত লেখাগুলির মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রস্বরূপ প্রতিভাত হবার লগ্নটি আভাসিত হচ্ছিল তবুও রবীন্দ্রাথ নিজেই তীব্র সমালোচনা করেছেন। এইটিই তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ এবং তার প্রকাশে তিনি প্রসন্নই হয়েছিলেন। তবে তাঁর মতে সমালোচনার তীব্র বাল্যকালেই বিদ্ধ হওয়া ভাল, যদিও রবীন্দ্রনাথ আজও মুক্ত নন সেই প্রহার থেকে। তখনকার বাংলাসাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ অপরিণত বলছেন, অল্পবয়সের সৃষ্টিপ্রয়াসে অপ্রয়োজনীয় কথা, অপরিণত বিন্যাসপদ্ধতি দিয়ে নিজেদের স্বাভাবিক শক্তিকে অতিক্রম করার একটা প্রবণতা থাকে। কিন্তু লেখার কমচর্চার মধ্য দিয়ে সেই কৃত্রিম গতিকে ঘনীভূত সৌন্দর্য ও সত্যকে চিনতে শেখায়। 'ভারতী'র পাতায় তাঁর এমন অনেকেই কাঁচা লেখা আছে, কিন্তু লেখার অদম্য বাসনাকে তিনি ছোটো করে দেখাননি। ''সে কালটা তো ভুল করিবারই কাল বটে কিন্তু বিশ্বাস করিবারও সময় সেই বাল্যকাল''। সেই উৎসাহের আগুন থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিপ্রাণের, তাঁর আত্মানুসন্ধানের পথ দেখেছিলেন— এ তাঁর নিজেরই অভিব্যক্তি।

আমেদাবাদ

আপাতদৃষ্টিতে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি আমেদাবাদে জজ ছিলেন; রবীন্দ্রনাথের বিলাতযাত্রার আগে, তাঁর বাড়ীতে থাকার ঘটনা, এই অংশের উপজীব্য। শাহীবাগের বাদশাহি আমলের এই প্রাসাদের এক বিরাট আকর্ষণ ছিল এবং তাঁর গল্প ও গানরচনার প্রেক্ষাপটও ছিল। প্রাসাদের পাঁচিলের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে 'ক্ষীণস্বচ্ছস্রোতা শবরমতী' নদী। সম্মুখভাগে খোলা ছাদ এবং নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে পায়রার কূজন। রাত্রে এই ছাদটির আকর্ষণ ছিল তাঁর কাছে, এখানে বেড়াতে বেড়াতে তিনি নিজে সুর দিয়ে প্রথম পর্বের অনেক গান রচনা করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের বিশাল গ্রন্থ সঞ্চয়ের মধ্যে টেনিসনের কাব্যগ্রন্থ সংস্কৃত সংগ্রহগ্রন্থ খুব সহজবোধ্য না হলেও তাঁকে আকৃষ্ট করত। সেইসঙ্গে ছিল অভিধানের সাহায্যে ইংরাজী বইপড়া। রবীন্দ্রনাথ খুব লঘু চালে বর্ণনা করলেও, এই অবস্থানের একটা সুদূর প্রসারী ফল তিনি পেয়েছিলেন তাঁর জীবনে।

বিলাত

বিলাতযাত্রা প্রসঙ্গে কাঁচা বয়সের অনভিজ্ঞতা নিয়ে 'ভারতী'তে প্রকাশিত কিছু চিঠির উল্লেখ করেছেন। 'অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া, আঘাত করিয়া, তর্ক করিয়া রচনার আতসবাজি করিবার এই প্রয়াস"। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে খুব অভিজ্ঞতা না থাকলেও সত্যেন্দ্রপত্নী জ্ঞানদানন্দিনীর তত্ত্বাবধানে তাঁর বিদেশযাত্রায় অভিজ্ঞতা না থাকার ধাক্কা খেতে হল না। তুষারপাত তাঁর কাছে এক সৌন্দর্যলোক খুলে দিয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথের পুত্রকন্যা তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিল। তাদের সঙ্গে খেলাধূলায় নিজেকে মাতিয়ে রাখবার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন।

কিন্তু বিদেশযাত্রার মূল উদ্দেশ্যই ছিল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থার আয়োজন, কিন্তু ভিন্ন পরিবেশে। ব্রাইটনের পাবলিক স্কুলে তিনি কিছুমাত্র বিড়ম্বিত হননি, কিন্তু বেশিদিন থাকা হল না, অবশ্য স্কুলের দোষে নয়। লন্ডনে তখন ছিলেন তারকনাথ পালিত, তিনি বুঝেছিলেন যে এই প্রথাগত শিক্ষায় তাঁর লাভ হবে না। লন্ডনের তীব্র শীতের মুখে একটি বাসায় তাঁকে একলা রাখলেন। লন্ডনের শীতঋতুর বিবর্ণ দীপ্তিহীন চেহারায় তিনি প্রকৃতির ঔদার্য দেখেননি। সঙ্গী ছিল একটি হারমোনিয়ম, ভারতবর্ষীয় কেউ এলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ধরে রাখার চেষ্টা করতেন। এখানে তাঁকে ল্যাটিন পড়ানোর একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানবসমাজের ভাব ও সভ্যতাভেদে তার রূপান্তর নিয়ে বিরাট গবেষণার চেষ্টা করতেন, যেদিন তথ্য পেতেন সেদিন উল্লাস ধরত না, আবার বিপরীত হলে বিমর্ষ হয়ে উঠতেন। রবীন্দ্রনাথের একটি সহৃদয় অনুভূতি ছিল। তিনি অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ ছিলেন। কিন্তু গবেষণাজনিত বিষণ্ণ এই অনশনক্লিষ্ট দরিদ্র মানুষটিকে দেখলে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বেদনাবোধ করতেন। শিক্ষকের মত ছিল—"পৃথিবীতে এক-একটা যুগে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানবসমাজে এই ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে; অবশ্য সভ্যতার তারতম্য অনুসারে সেই ভাবের রূপান্তর ঘটিয়া থাকে কিন্তু হাওয়াটা একই "—এই মত রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনে কোনোদিনও খণ্ডন করেননি।" এখনো আমার বিশ্বাস সমস্ত মানুষের সঙ্গে মনের একটি অখন্ড গভীর যোগ আছে, তাহার এক জায়গায় যে শক্তির ক্রিয়া ঘটে অন্যত্র গূঢ়ভাবে তাহা সংক্রামিত হইয়া থাকে।"

এরপর তিনি এলেন এক সুযোগ্য শিক্ষক মিঃ পার্কারের বাসায়। তাঁর নিজের স্ত্রীকে পীড়ন করার পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের কাছে দুঃখজনক ছিল। এরপর জ্ঞানদানন্দিনী ডেকে পাঠালেন তাঁকে ডেভনশিয়রে টার্কিনগর থেকে। দুটি শিশুসঙ্গী নিয়ে সেখানে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির খোলা দরজায় তার অপরূপ সৌন্দর্যে অভিভূত হলেন। 'ভগ্নতরী' কবিতাটি তিনি এইখানেই রচনা করেছিলেন। আবার লন্ডনে ফিরে গিয়ে স্থান পেলেন ডাক্তার স্কট নামে এক ভদ্র গৃহস্থের ঘরে। স্ত্রী ও তিনকন্যাকে নিয়ে তিনি থাকতেন। এই পরিবারের সঙ্গে এক মধুর প্রীতিস্নিগ্ধ সম্পর্ক তাঁর গড়ে উঠেছিল। মিসেস স্কট তাঁর চোখে ভারতীয় পতিব্রতা নারীর মতই ছিলেন। ঘর গৃহস্থালীর কাজে তিনি সুগৃহিনী ছিলেন। শুধুই কাজ নয়, সান্ধ্যআসরে পড়াশুনা গানবাজনার চর্চায় তিনিও অংশ নিতেন। সর্বোপরি ছিল এই য়ুরোপীয় মহিলার পতিভক্তি। অল্পবয়সের চোখে দেখা অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীচরিত্র সম্পর্কে আমরা নতুন কিছু ভাবনার

পরিচয় পাই। ''স্ত্রীলোকের প্রেমের স্বাবাবিক চরম পরিণতি ভক্তি। ....যেখানে ভোগবিলাসের আয়োজন প্রচুর, যেখানে আমোদ প্রমোদেই দিনরাত্রিকে আবিল করিা রাখে সেখানে এই প্রেমের বিকৃতি ঘটে, সেখানে স্ত্রী-প্রকৃতি আপনার পূর্ণ আনন্দ পায় না।'' কয়েকদিন পরে দেশে ফিরে যাবার ডাক এলেও এই পরিবারটি রবীন্দ্র-জীবনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছিল। আরও দু' একটি ঘটনা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবেই মুগ্ধ করেছিল— দুই ব্যক্তি সততা একটি যুবক ও একটি মালবাহককে রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবেই কিছু বেশি মুদ্রা দিয়েছিলে, কিন্তু সেই দুই ব্যক্তি মনে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ভুলবশতঃ তাদের প্রাপ্যের অধিক দিয়েছেন। বঞ্চনার দিকটি তিনি বড়ো করে মনে রাখেননি। কারণ বিশ্বাস করাটা মানুষের এক বিশেষ ধর্ম। আরেকটি কৌতুকপ্রদ ঘটনা বলেছেন— এক ইংরাজ রমণী তার স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর সম্বন্ধে বিলাপগান 'বেহাগ' রাগিনীতে গাইতে অনুরোধ করলেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি খুবই পছন্দ করেছিলেন এবং বারবারই অনুরোধ জানিয়েছিলেন তার বাড়ীতে আসার জন্য। কলকাতায় ফেরার আসন্নকালে তিনি এই বিধবামহিলার গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। অনেক বিপত্তি কাটিয়ে তিনি পৌঁছলেন, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক সেই বর্ণনা। সেখানে যাওয়ার পর তিনি যে দেহেমনে কি পরিমাণ বিড়ম্বিত হয়েছিলেন তারও সরস বর্ণনা রয়েছে এখানে।

লোকেন পালিত

লোকেন পালিত ছিলেন বিলাতে যুনিভার্সিটি কলেজে রবীন্দ্রনাথের সহধ্যায়ী বন্ধুষ যদিও বয়সে তিনি ছোটোই ছিলেন, কিন্তু বন্ধুত্বসম্পর্কে অসুবিধা ছিল না। লাইব্রেরিতে বসে তাদের ''নিরবচ্ছিন্ন হাস্যালাপ'' চলত, সেইসঙ্গে সাহিত্য আলোচনাও চলত।

রবীন্দ্রনাথের বাংলা বানান ও শব্দতত্ত্ব আজকের যুগেও যথেষ্ট আলোচনার বিষয়। তার সূচনার ইঙ্গিত এই অংশে রয়েছে। ডাক্তার স্কটের একটি কন্যাকে বাংলা বর্ণমালা শেখাতে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন যে ইংরাজী বানানরীতির মতই ''বাংলা বানানও বাঁধন মানে না। যুনিভার্সিটি কলেজের লাইব্রেরীতে বসে এই নিয়ম ব্যতত্র(মের একটা নিয়ম খুঁজিতে বাহির হইলাম।'' এই বিষয়ে লোকেন পালিতের সাহায্য রবীন্দ্রনাথকে বিস্মিত করেছিল।

লোকেন পালিতের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে ভারতবর্ষে ফেরার পরেও রবীন্দনরাতের সঙ্গে সেই হাস্যমুখর দিনগুলি সমানভাবেই চলতেলাগল, ক্ষেত্র প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হল। রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' পত্রিকা সম্পাদনার কালেও লোকেন পালিতের বিপুল উৎসাহে তাঁর উদ্যম দ্বিগুণ বেগে ছুটে চলেছে। তাঁর পঞ্চভূতের ড়ায়ারি, অজস্র কবিতা লোকেন পালিতের মফস্বলের 'বাংলা ঘরে' বসে লিখেছেন। সারারাত ধরে কাব্যালোচনা চলেছে। লোকেন পালিত রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক বৃহৎ মর্যাদার আসনে স্থান পেয়েছিলেন।

ভগ্নহৃদয়

রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, বিলাতে আরেকটি কাব্যরচনা আরম্ব হয়েছিল এবং সমাপ্ত হল কলকাতায় ফিরে এসে। মুদ্রিত হয়েছিল এবং সেই বয়সে তা রবীন্দ্রনাথের পছন্দও হয়েছিল। পাঠকরা সমাদর করেছিলেন। সর্বোপরি ত্রিপুরার মহাজার বীরচন্দ্রমাণিক্য উচ্চপ্রশংসা করে কবির গৌরবময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্বাবনা দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন আঠারো। আরেকটু পরিণত বয়সে এই কাব্যটি সম্বন্ধে তাঁর লেখা একটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন 'জীবনস্মৃতি'তে। সেখানকার বক্তব্য হচ্ছে, কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে মনের মধ্যে যে আলোছায়ার লীলাখেলা চলে, তাতে বাস্তবতা অপেক্ষা কল্পনার অস্ফুট মায়ালোক ধরা পড়তে চায়। মনে হত সকেলেই যেন আঠারো বছর বয়সে স্থির হয়ে রয়েছে। ''আমরা সকলে মিলেই একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে বাস করতেম। সেই কল্পনালোকের তীব্র সুখদুঃখও স্বপ্নে সুখদুঃখের মত।''

রবীন্দ্রনাথ তার পনেরো-ষোল বছর থেকে বাইশ-তেইশ বছর বয়সকে বলেছেন ''অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল। এই মানসিক অস্থিরতা তিনি বর্ণনা করছেন প্রচ্ছন্ন সহাস্য কৌতুক নিয়ে। মন তখন একটা অস্পষ্ট উদ্দেশ্যহীন ছায়ালোকে

ঘুরে বেড়ায়। দৃষ্টির অসচ্ছতা আবৃত হয় অনুকরণপ্রবণতায়। কিন্তু নিজেকে ব্যক্ত করার একটা অদম্য বাসনা তাকে চালিয়ে নিয়ে যায়। মনের সেই আবেগের তপ্ত প্রবাহ যতক্ষণ না যথার্থ সত্যরূপের সন্ধান পায়, ততক্ষণ "তাহারা ব্যাধির মত "মনকে পীড়া দেয়"। এই যন্ত্রণা থেকে যখনই কল্যাণের পথ বেরিয়ে আসে, তখনই আনন্দরূপ সেখানে বিকশিত হয়ে ওঠে।

বর্তমান যুগে ঔপনিবেশিকতার বিষ সম্পর্কে যখন আমরা তীক্ষ্ণ সমালোচনায় অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছি, অনেক যুক্তিজাল ছিন্ন করেছি রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যজীবনের প্রান্তভাগে এসে তাঁর ভাবনাগুলি পাঠকদের গোচরে এনেছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে তাঁর কালেই অর্থাৎ উনিশশতকে ইংরাজের জ্ঞানবিজ্ঞান সাহিত্যের মাদকতায় মানুষ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, কিন্তু প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে তাঁর দেশজ মন সেখান থেকে এমন কিছু পায়নি, যা মনের পুষ্টিসাধনে সাহায্য করে। সেক্সপীয়র, মিলটন, বায়রণ খুবই উঁচুমানের সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন তাঁদের "হৃদয়াবেগের প্রবলতা" নিয়ে। এই আবেগের উত্তাপ একটা দুরন্ত উন্মাদনার সৃষ্টি করত। আমাদের নিরুত্তাপ জীবনাচরণে যে ঝড় তুলবে এই সৃষ্টিকর্ম, সে তো জানা কথা। স্নিগ্ধ সৌন্দর্যসৃষ্টির বিপরীতে এই উত্তাল হৃদয় অনেক মলিনতাকে দৃশ্যমান করে। রবীন্দ্রনাথ ইংরাজী সাহিত্যকে মোটেই অসম্মান করেননি। য়ুরোপের রেনেশার প্রেক্ষাপটে "মানুষ আপনার হৃদয় প্রকৃতিকে তাহারই উদ্দাম শক্তির যেন চরম মূর্তি দেখিতে চাহিয়াছিল।" আমাদের স্থির গতিহীন সমাজে যখন জীবনের বিকাশ প্রতি পদে ব্যাহত হচ্ছিল, সেইরকম সময়েই পাশ্চাত্য সাহিত্যের "স্বাধীন ও সজীব হৃদয়ের অবাধ লীলার দীপকরাগিণীতে আমাদের চমক লাগিয়া গিয়াছিল। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় অংশ নিয়েছিলেন সেই মত উত্তেজনায়, সংযমের লক্ষই ছিল না।

এবার রবীন্দ্রনাথ যে কথাগুলি বলছেন একবিংশ শতাব্দীতে তার গুরুত্ব প্রবলভাবেই উপলব্ধি করা যাচ্ছে। প্রত্যেক দেশের মাটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। য়ুরোপের ইতিহাসে যে বজ্রকঠোর শৃঙ্খলের চেহারা ছিল, সেই বন্ধনমুক্তির বিশাল প্রয়াসই সেখানে দেখা গিয়েছিল। অন্তর ও বাহির ছিল সেখানে অঙ্গাঙ্গীবদ্ধ। আমাদের সমাজে সামান্য দোলাতেই আমরা "ঝড়ের ডাকের নকল" করতে গেলাম। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সাধনায় এবং শিল্পসৃষ্টিতে সৌন্দর্য ও সরলতার যে সমন্বয় দেখেছিলেন, তার পাশে ইংরাজী সাহিত্যের প্রবল অতিশয়তা তাঁকে ততটা অভিভূত করেনি। য়ুরোপীয় সাহিত্যকলাতেও আবেগপ্রাচুর্যের পরিবর্তে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের বিকাশ আছে, কিন্তু আমাদের সাহিত্যপর্বে সেগুলি স্থান পায়নি, তাই আমাদের সাহিত্যরচনারীতিতে নিজস্ব স্বভাববৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে বাধা পেয়েছিল।

এর পরের প্রসঙ্গটি য়ুরোপীয় সাহিত্যে নাস্তিকতা প্রবক্তা বেন্থাম মিল ও কোঁত। য়ুরোপে এটি স্বাভাবিক পর্যায়। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে আরোপিত। তাই নাস্তিকতার সমর্থন ছিল একটা আপাত-উত্তেজনার উপকরণ। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে তর্কের ঝড় উঠত। এই উত্তাল প্রবাহে বালক রবীন্দ্রনাথও আন্দোলিত হতেন। আবেগ-উত্তেজনাপ্রেমিক আরেকটি দলও ছিল, তাঁরা ভক্তিবিলাসী, কারণ পার্থিব সম্ভোগে তাঁদের অনীহা ছিল না। কিন্তু এতরকম আন্দোলনে সত্যসন্ধানের অনুপ্রেরণা ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যসৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিকায় তাঁর জীবনদর্শনকে ব্যাখ্যা করেছেন। সত্যানুধ্যান রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের সাধনা। তাঁর প্রথম যৌবনে সমাজবিবর্তনের যে চিহ্নগুলি ফুটে উঠেছিল, 'জীবনস্মৃতি' লিখবার কালে সেই প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রমানসের একটি বড় দিক ধরা পড়েছে। সত্য একটা স্থির প্রত্যয়বোধ, "তাহার পক্ষে ভাঙিয়া যাওয়া বা অন্য কোনোপ্রকার দুর্ঘটনা নিতান্ত বাহুল্য, কিন্তু যেন তাহা ভাঙিয়াছে এমন একটা ভাবাবেগ মনের নেশার পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক.....ইহাই দেবতাকে বাদ দিয়া দেবোপাসনার রসটুকু ছাঁকিয়া লওয়া।" এই কথা প্রসঙ্গে 'ভগ্নহৃদয়' অধ্যায়টি তিনি শেষ করেছেন, বলছেন দেশসেবা করতে হলে দেশের যথার্থ মূর্তিটি অনুভবের মধ্যে আনা চাই। শুধু হৃদয়াবেগ দিয়া দেশসেবা হয় না।

বিলাতী সংগীত

রবীন্দ্রনাথের সংগীত ভাবনার একটি বিশ্লেষণী দিক এই অংশের উপজীব্য। তিনি এখানে ভারতবর্ষের ও য়ুরোপের সংগীতের একটা তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। অন্যান্য অংশের তুলনায় এখানে কবির বক্তব্য অনেক প্রশ্ন নিয়ে আসে পাঠকের মনে। ব্রাইটনে আশ্চর্য কণ্ঠশক্তিসম্পন্না এক গায়িকার গান তিনি শুনেছিলেন। আমাদের দেশের ওস্তাদী গায়কদের তিনি সমালোচনা করেছেন, গান গাইবার মদ্যে কণ্ঠের যথাযথ সুরারোপ তাঁরা করেন না, উপরন্তু সুললিত গায়নভঙ্গিতে বিদ্রূপ করেন। মানুষ আবরণকে উপেক্ষা করে যেন তাঁরাগানের স্বরূপকে প্রকাস করতে চান। য়ুরোপীয় সঙ্গীতে আঙ্গিক বিন্যাস নিখুঁত হওয়া চাই। সোনে কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট সচলতা নিয়ে তারা অপরিসীম শক্তি দেখায়। তাদের গাইবার পদ্দতিতেই শ্রোতাদের আকর্ষণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছিল, "মনুষ্যকণ্ঠের প্রকৃতিকে যেন অতিক্রম করা হইতেছে।.....নিতান্ত একটা পথহারা ঝোড়ো হাওয়ার অশরীরী বিলাপের মত।" কিন্তু পুরুষকণ্ঠে একটা জীবন্ত মানুষের গানের উপলব্ধি হয়েছিল। তবে য়ুরোপীয় সংগীতের যথার্থ রসগ্রহণ করার মবোধ তাঁর তখন হয়নি। পরবর্তীকালে তিনি অনুভব করেছেন যে, য়ুরোপের গান যেন মানুষের বাস্তবজীবনের প্রতিচ্ছবি। আমাদের গান জীবনসম্পৃক্ত হয়েও তাকে অতিক্রম করে মনের মধ্যে এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্যরসের সৃষ্টি করে। "সেখানে কর্মনিরত সংসারীর জন্য কোনো সুব্যবস্থাই নাই।"

য়ুরোপের গানকে তিনি বলছেন রোমান্টিক। শব্দটিকে বিশ্লেষণ করা কঠিন কাজ। রবীন্দ্রনাথ তাকেই রোমান্টিক বলছেন যা মানবজীবনবৈচিত্র্যকে গানের সুরে রুপান্তরিত করে প্রকাশ করছে। আমাদের গানে সে প্রচেষ্টা সার্থকতামন্ডিত হয়নি। সেখানে ব্যক্ত হয় বিশ্বচরাচরের অব্যক্ত ভাষা, প্রকৃতির তাপ, স্নিগ্ধতা, বিষণ্ণতা, নিস্পৃহতা ও পরিণামে প্রকাশের উল্লাস— রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— 'বাক্যবিস্মৃত বিহ্বলতা।

বাল্মীকি প্রতিভা

বাল্মীকি প্রতিভা নাম দিয়ে আরম্ভ করলেও কবির স্মৃতির প্রেক্ষাপটে অনেক ঘটনা, অনেক আকাঙ্খা অনেক উচ্ছলতা ভেসে উঠছে। এক-একটি করে তিনি পট উত্তোলন করেছেন। বিলাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিছু বিলিতী সংগীত শিখেছিলেন, সেইসহেগ চোটবেলায় দেখা, কবি ম্যুরের রচিত আইরিশ মেলডীজের প্রতি আগ্রহ ছিল এবং শিখেছিলেন। দেশে পিরে বিলিতি গানের শ্রোতারা বলেছিলেন যে তাঁর গান গাইবার ও কথা বলার সুরে বিলেতের হাওয়া লেগেছে। দেশি ও বিদেশি সুরের সংমিশ্রণেই বাল্মীকি প্রতিভার জন্ম। হার্বার্ট স্পেন্সরের লেখায় রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন যে, মনে যে কোনো আবেগ ব্যক্ত হবার সময়ে তার একটি বিশেষ সুর থাকে। নানারকম চর্চার মধ্য দিয়ে আরও সুন্দর করার আগ্রহ এই আবেগগুলিকে সঙ্গীতে রূপান্তরিত করেছে। বাল্মীকী প্রতিভার বৈশিষ্ট্যগুলি এই পরিপ্রে(কায় রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। নাটকের মধ্যে যে বিভিন্ন অভিব্যক্তি থাকে, তারই উপযোগী করে এখানে সংগীত ব্যবহৃত হয়েছে। সঙ্গীতের একটি স্বাধীন বিচরণক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়েছে নাটকে। কোথাও বৈঠকি-গান-ভাঙা, কোথাও জ্যোতিরিন্দ্রনাথে গতের সুরে বসানো, কোথাও বিলিতি সুরের প্রয়োগ দেখা গেছে। বাল্মীকি প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত নিয়ে নতুন পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গীত অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত(হয়েই একটি বিশেষ মাত্রা অর্জন করেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, নাটকটি অপেরাধর্মী নয় 'ইহা সুরে নাটিকা'। বিষয়টি সুরের দ্বারা অভিনীত, সঙ্গীতের স্বতন্ত্র গৌরব এখানে নেই। কবির বাল্মীকি প্রতিভা রসগ্রাহী শিক্ষিত মহলে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল।

দশরথ অন্ধমুনির পুত্রকে বধ করেছিলেন— এই বিষয় অবলম্বনে লিখেছিলেন 'কালমৃগয়া', সেখানেও পূর্ব পন্থাই অনুসরণ করেছিলেন। করুণরস এখানে মুখ্য ছিল। অনেকদিন পরে লিখেছিলেন 'মায়ার খেলা'। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্যই যথেষ্ট, বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মেলা মায়ার খেলা তেমনই নাট্যের সূত্রে গানের মেলা।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীত প্রবাহের অবিশ্রান্ত গতির একটি চিত্র দিয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মার্গসংগীতের সুরকে পিয়ানোর সুরে নতুনরূপে দেবার চেষ্টা করছিলেন, এই পরীক্ষায় অনেক সময়েই রাগরাগিনীগুলি কিছু নিয়ম ভাঙার মধ্যে অপূর্ব সুরে রূপ নিত। সুরগুলি যাতে যথার্থ বাণীবহ হয়ে ওঠে, সেই চেষ্টায় কবি ও অক্ষয়বাবু শব্দযোজনার চেষ্টা করতেন। বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়াতে প্রথাবিরুদ্ধ দুঃসাহসিকতার যে প্রমাণ দেখিয়েছিলেন, কেউই তার বিরুদ্ধে বলেননি, বরং অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। সশ্রদ্ধ নম্রতায় রবীন্দ্রনাথ, বাল্মীকিপ্রতিভায় অক্ষয়বাবুর কয়েকটি গান ও দুটি গানে বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গালসংগীতের দু'এক স্থানের ভাষার ব্যবহার উল্লেখ করেছেন। প্রাণশক্তির বিপুল আবেগে তখন রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করেছেন, নিত্যনতুন সুর প্রচন্ড উদ্যমে অবিশ্রান্তভাবে সৃষ্টি করেছেন। "নিজেকে সকল দিকেই প্রচুরভাবে ঢালিয়া দিতেছি আমার সেই কুড়ি বছরের বয়সটাতে এমনই করিয়া পদক্ষেপ করিয়াছি।" তাঁর প্রেরণার উৎসমূলে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। কনিষ্ঠ ভ্রাতার সর্ববিষয়ে উৎসাহকে তাঁর এগিয়ে যাবার অদম্য প্রচেষ্টাকে তিনি দক্ষ সারথির মত চালনা করেছিলেন।

সন্ধ্যাসংগীত

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির বিশাল পরিসরে সন্ধ্যাসংগীত রচনার কালটি তাঁর কাছে বিশেষ স্মরণযোগ্য। কারণ এই সৃষ্টিতে তাঁর প্রথম চেতনা যে তাঁর কবিতা একান্তভাবে তাঁরই নিজস্ব, তার কোনো পূর্বসংস্কার নেই। অন্তরের বাঁধভাঙা আবেশ দিয়ে তার সৃষ্টি। এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কলকাতায় না থাকায় তাঁর তিনতলার নিভৃত ঘরটিতে কবির হৃদয়চারী নিভৃত আকাঙ্ক্ষাগুলি যেন ক্রমশঃ ব্যক্ত হতে চাইছিল। আপন মনের ধ্যান দিয়ে তিনি লিখেছেন আর মুছেছেন শ্লেটের গায়ে; যা লিখেছেন তা তাঁর হৃদয় থেকে উৎসারিত। সেখানেই স্বাধীনতার আনন্দ। ছন্দের দৃঢ়বন্ধনকে রক্ষা করলেন না, কারণ সবটাই নিজের হাতে গড়ার দুর্দম বাসনা, "তখনই সে যথার্থ আপনার অধীন নয়"। এখানেও আনন্দিত ও বিস্মিত শ্রোতা ছিলেন অক্ষয়বাবু। বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের ছন্দ রবীন্দ্রনাথ অনেক কবিতাতেই অনুসরণ করেছেন, তা তিনমাত্রামূলক। কিন্তু "এই বেগবান গতির নৃত্য" রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেছেন সন্ধ্যাসংগীতে। শৃঙ্খল ভাঙাতেই তাঁর আনন্দ, তাঁর কাব্যের গতির বহমানতা। তিনি নিজেই বলেছেন, কাব্যবিচারে সন্ধ্যাসংগীতের উৎকর্ষ তেমন না থাকলেও কবিতারচনায় কবির স্বাধীন মনের উন্মোচনই তাঁর কবিজীবনের স্মৃতিতে স্থায়ী হয়েছে।

গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ

গান নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বক্তব্য ও অনুভূতির বিবর্তনের একটি চিত্র এই অংশে পরিস্ফুট। ব্যারিষ্টার হবার আশায় রবীন্দ্রনাথের বিলাতযাত্রা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহর্ষি তাঁকে ডেকে পাঠান। দ্বিতীয়বার আবার ব্যবস্থা হলেও ঘটনাচক্রে তাঁকে ফিরে আসতে হয়। দ্বিতীয়বার বিলাত যাবার আগের দিন তিনি একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন বেথুন সোসাইটির আমন্ত্রণে মেডিকেল কলেজ হলে। বিষয়টি ছিল সংগীত এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল গানের সুর গানের কথাকে ফুটিয়ে তুলবে, সকণ্ঠে গান গেয়ে তিনি তার প্রমাণ দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন এবং উচ্চপ্রশংসিতও হয়েছিলেন। "জীবনস্মৃতি"তে তিনি জানাচ্ছেন যে পরবর্তীকালে সেই মত তিনি প্রত্যাহার করেছিলেন। কারণ গানের যে বিশিষ্ট প্রকৃতি, তাকে কখনই কথার প্রাধান্যে দমন করা যায় না। কারণ কথা "গানেরই বাহনমাত্র"। গানের বাক্য শেষে সুরের অনুরনন, সেইখানেই তার অনির্বচনীয়তা। কিন্তু আমাদের দেশে চিরকালই কথায় সুর বসানো হয়েছে। তাতে যে মাধুর্য প্রকাশ পায়নি এমন কথা বলা যায় না। তবুও কথাকে অতিক্রম করে সুরের একটা গভীর সুদূরতার মধ্যে মনকে টানে। এই অংশে "আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী"—তাঁর এই বিখ্যাত গানটি কীভাবে সুরগুঞ্জনের মধ্য দিয়ে এক অপরূপ চিত্র রচনা করেছিল, সংক্ষেপে সে ঘটনা বলেছেন। "খাঁচার মাঝে অচিন পাখী কমনে আসে যায়....." —বাউল গানের এই সুরেও তিনি উপলব্ধি করেছেন "এই অচিন

পাখীর নিঃশব্দ যাওয়া আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে।''

গঙ্গাতীর

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শিশুকাল থেকে অনেক আনন্দ উজ্জ্বল স্মৃতিবিজড়িত মুহূর্তের সাক্ষী গঙ্গার জলপ্রবাহ। দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা স্থগিত হবার পর রবীন্দ্রনাথ এলেন চন্দননগরে গঙ্গার তীরে মোরান সাহেবের বাগানে। সেখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন। গঙ্গার জলপ্রবাহের সহেগ প্রকৃতির উদাহর অতচ রাজকীয় মনোরম পরিবেশ রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিতভাবে এখানে ব্যক্ত করেছেন। ঘনঘোর বর্ষায় বর্ষারাগিনীর গান, সূর্যাস্তের সময়ে নৌকায় জ্যোতিদাদার বেহালাবাদন ও রবীন্দ্রনাথের গান সন্ধ্যায় পুরবীর বিষণ্ণ বেদনার বেহাগের আনন্দে রূপান্তর, পশ্চিম আকাশের সূর্যাস্ত থেকে চন্দ্রোদয় তারপর অন্ধকারে নিবিড় তীরের বনরেখা, শান্ত নদী— রবীন্দ্রনাথের কাছে ''সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ করা পূর্ণ-বিকশিত পদ্মফুলের মত।'' মোরান সাহেবের বাড়ীর বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে বিসেষ উল্লেখযোগ্য দুটি ছবি। এক ঘন পাতায় ঘেরা গাছের ডালে নিভৃতে একটি দোলায় দু'জনে দুলছে, আরেকটি ছিল উৎসববেশে সজ্জিত নরনারীর দুর্গপ্রাসাদের সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করছে। এই ছবি দুটি রবীন্দ্রনাথের কল্পনার পাখা অনেক দূর উড়িয়ে দিত। সন্ধ্যাসংগীতের যে সৃষ্টিকণা রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, এখানেও সেই কাব্যরচনার কাজই চলছে। সন্ধ্যাসংগীত তার অস্পষ্ট হৃদয়ানুভূতি প্রথাভাঙা ছন্দ নিয়ে কাব্যসমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু তার কাব্যজীবনের দারায় সন্ধ্যাসংগীত সূত্রহীন নয়। তিনি লোকালয়ের কলরবের মধ্যে থেকেও ছিলেন নিভৃতলোকের বাসিন্দা। তবুও সকল মানুষের আবেগের রূপসৃষ্টি এক ফতেআসেনা, নানা পরিবেশের নানা অভিব্যক্তি। কোথাও নিজেক প্রকাশ করতে না পারার বেদনা কোথাও অস্পষ্টতার বিষণ্ণতা। মানুষ এক এক পরিস্থিতিতে কাব্যের আধারে তার বাণীকে রূপ দেয়। সেই প্রেক্ষিতে সন্ধ্যাসংগীতের এক মনোগ্রাহী ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বাইরের সঙ্গে অন্তরের সম্পর্কটি যখন স্পষ্ট হয় না, তখন কবিপ্রাণের ক্রন্দনও অশ্রুত থাকে। এক অব্যক্ত বিষণ্ণতা তাকে ঘিরে রহস্যময় হয়ে ওঠে। অন্তরের অ-প্রকাশের ব্যর্থতার জাল ছিন্ন করে কবিসত্তা উদগ্রীব হয়েছিল আত্ম-উন্মোচনে। '' সেই যুদ্ধের ইতিহাসই অস্পষ্ট ভাষায় সন্ধ্যাসংগীতে প্রকাশিত হইয়াছে।'' একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করেছেন। রমেশচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে রমেশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের গলায় যে মালাটি দিয়েছিলেন সেইটিই বঙ্কিমচন্দ্র পরিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। সন্ধ্যাসংগীতের জন্যই এই পুরস্কার।

প্রিয়বাবু

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সাহিত্যের সাতসমুদ্রের নাবিক' প্রিয়নাথ সেন। তিনি 'ভগ্নহৃদয়' পড়ে বিশেষ তুষ্ট হননি, কিন্তু 'সন্ধ্যাসংগীতে' তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিশ্বাসাহিত্যের আসরে যেমন তাঁর অবাধ গতিবিধি ছিল, তেমনই আত্মবিশ্বাস ছিল নিজের মত প্রতিষ্ঠায়। তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু ছিলেন, প্রিয়বাবুর ভালমন্দলাগা রবীন্দ্রনাথকে প্রথম জীবনের কাব্যসৃষ্টিতে যে নিশ্চিত সাফল্যের সম্ভাবনা দেখিয়েছিলেন, সে কথা রবীন্দ্রনাথ বিস্মৃত হননি।

প্রভাতসংগীত

সন্ধ্যাসংগীত রচনাকালে ছোট ছোট রঙীন কল্পনা নানা আকারে রবীন্দ্রনাথের মনকে অধিকার দিত। সেই রঙিন ভাবনাগুলিকে তিনি গদ্যের আকারে রূপ দিয়েছিলেন, যা পরে 'বিবিধ প্রসঙ্গ নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানেও ছিল নিজের মত করে লেখার সঙ্কল্প। যদিও প্রভাতসঙ্গীত রচনার ইতিহাস সুবিদিত, তবুও রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় তাঁর ''হৃদয় আজি মোর কেমনে গলে খুলি''— এই বৃত্তান্তটুকু জীবনস্মৃতিতে অতি সরসভাবে বলা হয়েছে। জ্যোতিদাদার সদর স্ট্রীটের বাড়ীতে থাকাকালীন এক বিচিত্র অচেনা অনুভূতি তাঁর মনের গভীরে এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করল। '' তখন তিনি 'বউ ঠাকুরানীর হাট' ও 'সন্ধ্যাসংগীত' লিখছেন। একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ার ছাদে সন্ধ্যার আলোয় বিশ্বচরাচর তাঁর চোখে সুন্দররূপে প্রতিভাত হল। এ এক অজানা অভিজ্ঞতা। তারপর এল সেই বিশেষ

দিনটি। সদর স্ট্রীটের বাড়ীতে গাছপালার মধ্য দিয়ে সূর্যোদয়ের অপূর্ব দৃশ্য মনের বহিরাবরণ ভেদ করে "সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।" 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি জন্ম নিল সেই পরম লগ্নে। এতদিন চোখ ভরে প্রকৃতির যে সৌন্দর্য তিনি উপভোগ করেছেন, আজ তা অন্তরমুখী হয়ে সত্তার গভীর থেকে বেরিয়ে এল। বলছেন রবীন্দ্রনাথ—"সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম।" জীবনস্মৃতির কথনে সেই কবিই আত্মপ্রকাশ করলেন যিনি চৈতন্য দিয়ে অখন্ডতার উপলব্ধিকে তাঁর জীবনসাধনায় অচ্ছেদ্যবন্ধনে বেঁধেছিলেন।

এরপর তাঁর হিমালয়ভ্রমণ, কিন্তু সেই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তিনি মানবজীবনের কলধ্বনিকে মেশাতে পারলেন না। তবুও মনের ব্যাকুলতা রইল, সেই আবেগে সৃষ্টি করলেন 'প্রতিধ্বনি' কবিতা। বিশ্বের সৌন্দর্য 'প্রতিঘাত' পেয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে। সেইখানেই কবির ভালবাসা। যে জটিলতার অরণ্যে কবির পথভ্রষ্ট মন অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়িয়েছিল এতদিন, সেই অরণ্যেই তীব্র আলোর ছটায় কবি বিশ্বময় এক সর্বব্যাপী আনন্দকে প্রত্যক্ষ করলেন। 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁর উপলব্ধির দার্শনিক ব্যাখ্যা করেছেন 'প্রতিধ্বনি' কবিতাটি প্রসঙ্গে। 'প্রভাতসংগীত' সম্বন্ধে নানাস্থানেই তাঁর অভিমত দিয়েছেন। সর্বব্যাপী হৃদয়-অভিযানের যে দুর্দমনীয় চলমানতা তা প্রথম যৌবনের ধর্ম। ক্রমশঃই তা ঘনীভূত হয়ে সীমা ও অসীমের রহস্যলোকে প্রবেশ করে। "প্রভাতসংগীত" আমার অন্তঃপ্রকৃতির প্রথম বহির্মুখ উচ্ছ্বাস, সেজন্য ওটাতে আর কিছুমাত্র বাছবিচার নাই।"

এখানেও তাঁর শিশুকালের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। চেতন জগৎ প্রসারিত হত কল্পনার জগতে। কিন্তু বুভুক্ষিত হৃদয়ে আলো জ্বলেনি। সেই ব্যথা থেকে ঝরে পড়েছে সন্ধ্যাসংগীত কিন্তু শিশুর চোখে দেখা সেই উপলব্ধির ওপর থেকে আবরণ সরে গিয়ে হঠাৎ যেন বিশ্বসৌন্দর্য নতুন রূপে ধরা দিল কবির চোখে। একটি অনুভবকে কেন্দ্র করেই পর্ব থেকে পর্বান্তরে তাঁর যাত্রা, সেই যাত্রার পথের আনন্দের প্রথম সঙ্গী 'প্রভাতসংগীত'।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

ঠাকুরবাড়ীর সন্তানরা প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন নিঃসন্দেহে, তাঁরা সর্বদাই একটা গঠনমুলক চিন্তায় সক্রিয় থাকতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিলিতভাবে একটি পরিষৎ স্থাপনের সঙ্কল্প করেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সভাপতি হলেন; কিন্তু বিদ্যাসাগর সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সভ্য হয়েও নিষ্ক্রিয় রইলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একক প্রচেষ্টায় ভৌগলিক পরিভাষা নির্ণয়ের কাজে হাত দেওয়া হল। কিন্তু অল্পদিনেই সমিতি বন্ধ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ এই অক্লান্ত কর্মীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। সদাপ্রসন্ন রাজেন্দ্রলালের বিভিন্ন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান ছিল, বহু নতুন বিষয়ও তিনি আলোচনা করতেন। তাঁর বাংলাভাষারীতি ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান রবীন্দ্রনাথকে উপকৃত করেছিল। তাছাড়া তখনকার কালের পাট্যপুস্তক-নির্বাচন সমিতির তিনি অন্যতম প্রধান সভ্য ছিলেন। তাঁর কাজ করানোর ক্ষমতা ছিল। এশিয়াটিক সোসাইটি সভার গ্রন্থপ্রকাশ ও পুরাতত্ত্ব আলোচনার কাজে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতদের নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর তেজস্বী চরিত্রকে প্রতিপক্ষ ভয় পেত। তিনি ছিলেন মননশীল লেখক। সর্বোপরি তা মনুষ্যত্বের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র। রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবেই তাঁর স্নেহধন্য ছিলেন। কিন্তু আক্ষেপ করেছেন রবীন্দ্রনাথ এই বলে যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত মনস্বীপুরুষ দেশবাসীর কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান অর্জন করেননি।

কারোয়ার

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কারোয়ার জজ থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথরা সদলবলে সেখানে গিয়েছিলেন। নগরটি বোম্বাই-এর দক্ষিণে কর্ণাটের প্রধান নগর—"তাহা এলালতা ও চন্দনতরুর জন্মভূমির মলয়াচলের দেশ।" পাহাড়বেষ্টিত এই সমুদ্র-বন্দরটির বেলাভূমি যেন আকাশের নীলিমায় মিশে যেতে চাইছে। এ এক অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য। ঝাউগাছের